

📖 হাদীসের নামে জালিয়াতি

বিভাগ/অধ্যায়ঃ আলিমুল গাইব ও হাযির-নাযির প্রসঙ্গ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

৪৩. দলীল ও ব্যাখ্যার তুলনামূলক পর্যালোচনা

যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইলমুল গাইবের বা হাযির-নাযির হওয়ার দাবি করেন তাঁরা নিজেদের পছন্দ বা বিভিন্ন আলিমের বক্তব্যের ভিত্তিতে একটি ‘মত’ গ্রহণ করেন। এরপর এ সকল দ্ব্যর্থবোধক বা ফযীলত বোধক আয়াত ও হাদীসকে তাঁদের মতের পক্ষে ব্যাখ্যা করে সে ব্যাখ্যাকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। এরপর তাঁদের ‘মত’ ও ‘ব্যাখ্যা’র ভিত্তিতে অগণিত সুস্পষ্ট আয়াত ও হাদীসকে ব্যাখ্যার মাধ্যমে বাতিল করে দেন। পাঠকের হৃদয়ঙ্গমের জন্য এখানে তাঁদের এরূপ কয়েকটি ‘দলীল’ আলোচনা করছি।

প্রথম দলীল: কুরআনে বিভিন্ন স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ‘শাহিদ’ ও ‘শাহীদ’ (شاهد وشهيد) বলা হয়েছে।[1] এ শব্দ দুটির অর্থ ‘সাক্ষী’, ‘প্রমাণ’, ‘উপস্থিত’ (witness, evidence, present) ইত্যাদি। সাহাবীগণের যুগ থেকে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত মুফাসসিরগণ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীকে (ﷺ) দীন প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে ও সাক্ষীরূপে প্রেরণ করেছেন। যারা তাঁর প্রচারিত দীন গ্রহণ করবেন, তিনি তাঁদের পক্ষে সাক্ষ্য দিবেন। এছাড়া পূর্ববর্তী নবীগণ যে তাদের দীন প্রচার করেছেন সে বিষয়েও তিনি এবং তাঁর উম্মাত সাক্ষ্য দিবেন। অনেকে বলেছেন, তাঁকে আল্লাহ তাঁর একত্বের বা ওয়াহদানিয়্যতের সাক্ষী ও প্রমাণ-রূপে প্রেরণ করেছেন।[2]

এখানে উল্লেখ্য যে, অনেক স্থানে মুমিনগণকেও মানব জাতির জন্য ‘শাহীদ’ বলা হয়েছে।[3] অনেক স্থানে আল্লাহকে ‘শাহীদ’ বলা হয়েছে।[4]

যারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে ‘সকল অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী’ বা ‘হাযির-নাযির’ বলে দাবি করেন তাঁরা এই ‘দ্ব্যর্থবোধক’ শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ গ্রহণ করেন। এরপর সেই অর্থের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে কুরআনের সকল সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বাণী বাতিল করে দেন। তাঁরা বলেন, ‘শাহিদ’ অর্থ উপস্থিত। কাজেই তিনি সর্বত্র উপস্থিত। অথবা ‘শাহিদ’ অর্থ যদি সাক্ষী হয় তাহলেও তাঁকে সর্বত্র উপস্থিত থাকতে হবে। কারণ না দেখে তো সাক্ষ্য দেওয়া যায় না। আর এভাবে তিনি সদা সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান বা হাযির-নাযির ও সকল স্থানের সকল গোপন ও গাইবী জ্ঞানের অধিকারী।

তাঁদের এ ব্যাখ্যা ও দাবির ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়:

প্রথমত: তাঁরা এ সকল আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবী, তাবিয়ী ও পূর্ববর্তী মুফাসসিরদের মতামত গ্রহণ না করে নিজেদের মর্জি মারফিক ব্যাখ্যা করেন এবং সাহাবী-তাবিয়ীদের ব্যাখ্যা বাতিল করে দেন।

দ্বিতীয়ত: তাঁরা একটি দ্ব্যর্থবোধক শব্দের ব্যাখ্যাকে মূল আকীদা হিসাবে গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে কুরআন ও হাদীসের অগণিত দ্ব্যর্থহীন নির্দেশনা নিজেদের মর্জিমাফিক বাতিল করে দিলেন। তাঁরা এমন একটি অর্থ গ্রহণ করলেন, যে অর্থে একটি দ্ব্যর্থহীন আয়াত বা হাদীসও নেই। সাহাবী, তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী বা কোনো ইমামও

কখনো এ কথা বলেন নি।

তৃতীয়ত: তাঁদের এ ব্যাখ্যা ও দাবি মূলতই বাতিল। তাদের ব্যাখ্যা অনুসারে প্রত্যেক মুসলিমকেই ‘ইলমে গাইবের অধিকারী’ ও হাযির-নাযির বলে দাবি করতে হবে। কারণ মুমিনগণকেও কুরআনে ‘শাহীদ’ অর্থাৎ ‘সাক্ষী’ বা ‘উপস্থিত’ বলা হয়েছে এবং বারংবার বলা হয়েছে যে, তাঁরা পূর্ববর্তী সকল উম্মাত সহ পুরো মানব জাতি সম্পর্কে কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দিবেন। আর উপস্থিত না হলে তো সাক্ষ্য দেওয়া যায় না। কাজেই তাঁদের ব্যাখ্যা ও দাবি অনুসারে বলতে হবে যে, প্রত্যেক মুমিন সৃষ্টির শুরু থেকে বিশ্বের সর্বত্র সর্বদা বিরাজমান এবং সবকিছু দেখছেন ও শুনছেন। কারণ না দেখে তাঁরা কিভাবে মানবজাতির পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবেন?!

দ্বিতীয় দলীল: কুরআন কারীমে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

“নবী মুমিনগণের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর (closer) এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা। এবং আল্লাহর কিতাবে আত্মীয়গণ পরস্পর পরস্পরের ঘনিষ্ঠতর।”[5]

এখানে ‘আউলা’ (أولى) শব্দটির মূল হলো ‘বেলায়াত’ (الولاية), অর্থাৎ বন্ধুত্ব, নৈকট্য, অভিভাবকত্ব ইত্যাদি।

“বেলায়েত” অর্জনকারীকে “ওলী” (الولي), অর্থাৎ বন্ধু, নিকটবর্তী বা অভিভাবক বলা হয়। ‘আউলা’ অর্থ ‘অধিকতর ওলী’। অর্থাৎ অধিক বন্ধু, অধিক নিকটবর্তী, অধিক যোগ্য বা অধিক দায়িত্বশীল (more entitled, more deserving, worthier, closer)।

এখানে স্বভাবতই ঘনিষ্ঠতর বা নিকটতর (closer) বলতে ভক্তি, ভালবাসা, দায়িত্ব, সম্পর্ক ও আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতা বুঝানো হচ্ছে। মুমিনগণ রাসূলুল্লাহকে তাঁদের নিজেদের চেয়েও বেশি আপন, বেশি প্রিয় ও আনুগত্য ও অনুসরণের বেশি হক্কদার বলে জানেন। এই ‘আপনত্বের’ একটি দিক হলো যে, তাঁর স্ত্রীগণ মুমিনদের মাতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। আবার উম্মাতের প্রতি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দরদ ও প্রেম উম্মাতের আপনজনদের চেয়েও বেশি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বয়ং এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এ কথা বলেছেন। জাবির, আবু হুরাইরা প্রমুখ সাহাবী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

مَا مِنْ مُّؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَىٰ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اقرءوا إِنْ شِئْتُمْ: النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ. فَأَيُّمَا مُّؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصْبَتُهُ مَنْ كَانُوا وَمَنْ تَرَكَ دِينًا أَوْ ضِيَاعًا فَلْيَأْتِنِي (فَالْيَّيَّ وَعَلَيَّ، عَلَيَّ قَضَاؤُهُ) فَأَنَا مَوْلَاهُ

“প্রত্যেক মুমিনের জন্যই দুনিয়া ও আখেরাতে আমি তার অধিকতর নিকটবর্তী। তোমরা ইচ্ছা করলে আল্লাহর বাণী পাঠ কর: “নবী মুমিনগণের কাছে তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর”। কাজেই যে কোনো মুমিন যদি মৃত্যুবরণ করে এবং সে সম্পদ রেখে যায়, তবে তার উত্তরাধিকারীগণ যারা থাকবে তারা সে সম্পদ গ্রহণ করবে। আর যদি সে ঋণ রেখে যায় বা অসহায় সন্তান-সন্ততি রেখে যায় তবে তারা যেন আমার কাছে আসে; তা পরিশোধের দায়িত্ব আমার উপরেই থাকবে। কারণ আমিই তার আপনজন।”[6]

কিন্তু ‘হাযির-নাযির’-এর দাবিদারগণ দাবি করেন যে, এখানে দৈহিক নৈকট্য বুঝানো হয়েছে। কাজেই তিনি সকল মুমিনের কাছে হাযির আছেন।

এখানেও আমরা দেখছি যে একটি বানোয়াট ব্যাখ্যার ভিত্তিতে তারা কুরআন ও হাদীসে অগণিত দ্ব্যর্থহীন নির্দেশকে

বাতিল করে দিচ্ছেন। তাঁরা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর ব্যাখ্যাকেও গ্রহণ করছেন না। সর্বোপরি তাদের এ ব্যাখ্যা সন্দেহাতীতভাবেই বাতিল। কারণ এ আয়াতেই বলা হয়েছে যে “আত্মীয়গণ পরস্পর পরস্পরের ঘনিষ্ঠতর”। অন্যত্রও বলা হয়েছে যে, “আত্মীয়গণ একে অপরের ঘনিষ্ঠতর বা নিকটতর।”[7] তাহলে এদের ব্যাখ্যা অনুসারে আমাদের বলতে হবে যে, সকল মানুষই হাযির নাযির। কারণ সকল মানুষই কারো না কারো আত্মীয়। কাজেই তারা সদাসর্বদা তাদের কাছে উপস্থিত এবং তাদের সবকিছু দেখছেন ও শুনছেন!

অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী (ﷺ) ও মুমিনগণ মানুষদের মধ্যে ইবরাহীম (আঃ)–এর সবচেয়ে ‘নিকটতর’ বা ‘ঘনিষ্ঠতর’ (أَوْلَىٰ) [8] এখানে দাবি করতে হবে যে, সকল মুমিন ইবরাহীমের নিকট উপস্থিত...!

অন্য হাদীসে ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মদীনায় আগমন করেন, তখন ইহুদীদের আশুরার সিয়াম পালন করতে দেখেন। তিনি তাদের এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। তারা বলে, এ দিনে আল্লাহ মূসা (আঃ) ও ইসরাঈল সন্তানদেরকে ফেরাউনের উপর বিজয় দান করেন। এজন্য মূসা (আঃ) কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এ দিন সিয়াম পালন করেন। তখন তিনি বলেন:

نَحْنُ أَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ (مِنْهُمْ) وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

“তোমাদের চেয়ে আমরা মূসা (আঃ)–এর নিকটতর। একথা বলে তিনি এ দিনে সিয়াম পালনের নির্দেশ প্রদান করেন।”[9] এখন আমাদের দাবি করতে হবে যে, আমরা মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেক সদস্য মূসার কাছে উপস্থিত!!

তৃতীয় দলীল: আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন,

صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ (رَقِيَ الْمَنْبَرُ) فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْإِنْصِرَافِ (أَتِمُّوا الصُّفُوفَ) فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي (خَلْفَ ظَهْرِي/مِنْ وَرَاءَ ظَهْرِي)، فِي الصَّلَاةِ وَفِي الرُّكُوعِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِي كَمَا أَرَاكُمْ (مِنْ أَمَامِي)

একদিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। সালাতের পরে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে (মিস্বরে আরোহণ করে) তিনি বলেন: হে মানুষেরা, আমি তোমাদের ইমাম। কাজেই তোমরা আমার আগে রুকু করবে না, সাজদা করবে না, দাঁড়াবে না এবং সালাত শেষ করবে না। (অন্য বর্ণনায়: কাতারগুলো পূর্ণ করবে।) কারণ আমি তোমাদেরকে দেখতে পাই আমার সামনে এবং আমার পিছনে, যখন তোমরা রুকু কর এবং যখন তোমরা সাজদা কর। (অন্য বর্ণনায়: সালাতের মধ্যে এবং রুকুর মধ্যে আমি আমার পিছন থেকে তোমাদেরকে দেখি যেমন আমি সামনে থেকে তোমাদেরকে দেখি।)[10]

এ অর্থে আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

هَلْ تَرَوْنَ قِبَلَتِي هَا هُنَا وَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ رُكُوعُكُمْ وَلَا خُشُوعُكُمْ وَإِنِّي لَأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي

“তোমরা কি এখানে আমার কিবলাহ দেখতে পাচ্ছ? আল্লাহর কসম, তোমাদের রুকু, সাজদা এবং বিনম্রতা আমার কাছে অপ্রকাশিত থাকে না এবং আমি তোমাদেরকে আমার পিঠের পিছনে দেখি।”[11]

এ হাদীস থেকে আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা জানতে পারছি। তা হলো অন্যান্য মানুষ যেভাবে সামনে দেখে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পিছনেও সেভাবে সাহাবীগণের রুকু-সাজদা ইত্যাদি দেখতেন। ইসলামী আকীদার অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এখানেও তিনটি ধারা বিদ্যমান:

(ক) মুতামিলী ও ‘আকল’ বা জ্ঞানবুদ্ধির অনুসারী বলে দাবিদার কিছু মুসলিম। তাঁরা সহীহ হাদীসে প্রমাণিত এ বিষয়টিকে তাঁর ‘বাসারিয়াত’ বা মানবত্বের সাথে সাংঘর্ষিক বলে কল্পনা করে এ অর্থের হাদীসগুলি ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা বলেন: এখানে ‘দেখি’ অর্থ ‘ধারণা করি’, কারণ ‘দেখা’ আরবীতে ‘ধারণা’ বা মনের দেখা অর্থে ব্যবহৃত হয়, অথবা দেখি অর্থ আমাকে সংবাদ দেওয়া হয়... ইত্যাদি। তাঁদের দাবি: কুরআন প্রমাণ করে যে, তিনি মানুষ, আর মানুষ পিছনে দেখতে পারে না, অতএব কুরআনের অর্থ সংরক্ষণের জন্য এ হাদীসের এরূপ ব্যাখ্যা জরুরী। তাঁরা দাবি করেন, তাদের এ ব্যাখ্যা আরবী ভাষা ও কুরআন-হাদীসের ব্যবহারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু বাস্তবে এরূপ ব্যাখ্যা ওহীর বিকৃতি মাত্র। মানবত্ব ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বৈপরীত্য কল্পনা করার কারণেই এ বিকৃতি।

(খ) শীয়া ও পরবর্তীকালে সুন্নীগণের মধ্যকার অতিভক্তিতে নিমজ্জিত মুসলিমগণ। তাঁরা ‘পিছনে দেখা’-র এ হাদীসটির একটি বিশেষ অর্থ গ্রহণ করেন, তা হলো: ‘বিশ্বের সকল স্থান ও সময়ের সবকিছু দেখতে পাওয়া’। এর ভিত্তিতে তাঁরা তাঁকে ‘আলিমুল গাইব’ ও ‘হাযির-নাযির’ বলে দাবি করেন। এরপর তাঁর বাসারিয়াত বিষয়ক ও ‘গাইব না জানা’ বিষয়ক কুরআন-হাদীসের অগণিত সুস্পষ্ট বক্তব্যগুলো ব্যাখ্যাপূর্বক বাতিল করেন।

(গ) সাহাবী-তাবিয়ীগণ ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের ধারা। তাঁরা বাসারিয়াত বা মানবত্ব ও ‘পশ্চাত-দর্শন’ উভয় বিষয়কে স্বাভাবিক ও প্রসিদ্ধ অর্থে গ্রহণ করেন এবং সরল অর্থে বিশ্বাস করেন।

হাদীসটি পাঠ করলে বা শুনলে যে কেউ অনুভব করবেন যে, বিষয়টি স্বাভাবিক দৃষ্টি ও দর্শনের বিষয়ে। মানুষ যেকোনো সামনের দিকে দেখতে পায়, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাতের মধ্যে সেভাবেই পিছনে দেখতে পেতেন। হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে স্পষ্টভাবেই জানা যায় যে, এ দর্শন ছিল সালাতের মধ্যে ও রুকু সাজদার মধ্যে। অন্য সময়ে তিনি এইরূপ দেখতেন বলে কোনো হাদীসে বর্ণিত হয় নি। তা সত্ত্বেও যদি তা মনে করা হয় যে, তিনি সর্বদা এইরূপ সামনে ও পিছনে দেখতে পেতেন, তবুও এ হাদীস দ্বারা কখনোই বুঝা যায় না যে, তিনি দৃষ্টির আড়ালে, ঘরের মধ্যে, পর্দার অন্তরালে, মনের মধ্যে বা অনেক দূরের সবকিছু দেখতে পেতেন। তা সত্ত্বেও যদি কুরআন ও হাদীসের বিপরীত ও বিরোধী না হতো, তবে আমরা এই হাদীস থেকে দাবি করতে পারতাম যে, তিনি এভাবে সর্বদা সর্বস্থানের সর্বকিছু দেখতেন এবং দেখতেন। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, বিভিন্ন আয়াতে ও অগণিত সহীহ হাদীসে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে বারংবার এর বিপরীত কথা বলা হয়েছে। মূলত মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়মত রাসূল (ﷺ)-কে এরূপ ঝামেলা ও বিড়ম্বনাময় দায়িত্ব থেকে উদ্ধার রেখেছেন। ইবনু হাজার আসকালানী বলেন:

ظاهر الحديث إن ذلك يختص بحالة الصلاة ويحتمل أن يكون ذلك واقعا في جميع أحواله وأغرب الداودي الشارح فحمل البعدية هنا على ما بعد الوفاة يعني أن أعمال الأمة تعرض عليه وكأنه لم يتأمل سياق حديث أبي هريرة حيث بين فيه سبب هذه المقالة

“হাদীসের বাহ্যিক বা স্পষ্ট অর্থ থেকে বুঝা যায় যে, পিছন থেকে দেখতে পাওয়ার এ অবস্থাটি শুধুমাত্র সালাতের জন্য খাস। অর্থাৎ তিনি শুধু সালাতের মধ্যেই এইরূপ পিছন থেকে দেখতে পেতেন। এমনও হতে পারে যে, সর্বাবস্থাতেই তিনি এইরূপ দেখতে পেতেন।... দাউদী[12] নামক ব্যাখ্যাকার একটি উদ্ভট কথা বলেছেন। তিনি এ বর্ণনায় ‘পরে’ শব্দটির অর্থ ‘মৃত্যুর পরে’ বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ উম্মাতের কর্ম তাঁর কাছে পেশ করা হবে। সম্ভবত তিনি আবু হুরাইরার (রা) হাদীসের সামগ্রিক অর্থ চিন্তা করেননি, যেখানে এ কথার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে...।[13]

এখানে লক্ষণীয় যে, দাউদীর যুগ বা হিজরী ৯ম শতাব্দী পর্যন্ত এরূপ উদ্ভট ব্যাখ্যাকারীরাও ‘দেখা’ বলতে

‘উম্মাতের কর্ম তাঁর কাছে উপস্থিত করা হলে দেখেন’ বলে দাবি করতেন। তিনি মদীনায়ে নিজ কবরে অবস্থান করে সবত্র সবকিছু দেখেন অথবা সদা সর্বদা সর্বত্র উপস্থিত হয়ে সব কিছু দেখেন বলে কেউ কল্পনা করে নি। সর্বোপরি পিছনে ‘দেখা’ বা ‘গায়েবী দেখা’ দ্বারা ‘সদা সর্বদা সর্বত্র উপস্থিতি’ বা সবকিছু দেখা প্রমাণিত হয় না। কুরআনে বলা হয়েছে যে, শয়তান ও তার দল মানুষদেরকে গায়েবীভাবে দেখে:

إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ

“সে (শয়তান) ও তার দল তোমাদিগকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না।”[14]

এখানে কি কেউ দাবি করবেন যে, যেহেতু “তোমাদিগকে দেখে” (يراكم) বর্তমান কালের ক্রিয়া, সেহেতু শয়তান ও তার দলের প্রত্যেকে ‘হাযির ও নাযির’: তারা সদা সর্বদা সকল স্থানের সকল মানুষকে একই ভাবে দেখছে?

চতুর্থ দলীল: বিভিন্ন হাদীসে উম্মাতের বিভিন্ন কর্ম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পেশ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উম্মাতের দরুদ-সালাত তাঁর নিকট পেশ করা হয় অর্থে অনেকগুলো সহীহ হাদীস বর্ণিত। এছাড়া উম্মাতের সাধারণ কর্মও তাঁর নিকট পেশ করা হয় অর্থে হাদীস বর্ণিত।

এক হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

حَيَاتِي خَيْرٌ لَّكُمْ تُحَدِّثُونَ وَنُحَدِّثُكُمْ ، وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَّكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ ، فَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرٍ حَمَدْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ.

“আমার জীবন তোমাদের জন্য কল্যাণকর; তোমরা কথা বল এবং আমিও তোমাদের সাথে কথা বলি। এবং আমার মৃত্যু তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তোমাদের কর্ম আমার কাছে পেশ করা হবে। আমি ভালকর্ম দেখলে সেজন্য আল্লাহর প্রশংসা করব এবং খারাপকর্ম দেখলে তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছ ক্ষমা চাইব।” ইমাম হাইসামী বলেন: সনদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। কোনো কোনো মুহাদ্দিস সনদের দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন।[15]

এরূপ একটি বক্তব্য প্রসিদ্ধ তাবিয়ী সাযীদ ইবনুল মুসাইয়িব (৯০ হি) থেকেও দুর্বল সনদে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে উম্মাতের জন্য “শাহিদ” হবেন বা সাক্ষ্য দিবেন তা ব্যাখ্যা করতে ইবনুল মুসাইয়িব বলেন:

ليس من يوم إلا تعرض على النبي ﷺ أمته غُدوة وعشيّة، فيعرفهم بأسمائهم وأعمالهم، فلذلك يشهد عليهم،

“প্রতি দিনই সকালে বিকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে তাঁর উম্মাতকে পেশ করা হয়, ফলে তিনি তাদেরকে তাদের নামে ও কর্মে চিনতে পারেন। এজন্য তিনি তাদের বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করবেন।”[16]

উম্মাতের আমল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পেশ করার এ সকল হাদীসকে তাঁর ‘হাযির-নাযির’ ও ‘আলিমুল গাইব’ হওয়ার ‘দলীল’ হিসেবে পেশ করা হয়। এখানে নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষণীয়:

(১) উপরের হাদীসটি এবং সাযীদ ইবনুল মুসাইয়িবের বক্তব্য নিশ্চিতভাবে ‘হাযির-নাযির’ ও ‘আলিমুল গাইব’ মতটি বাতিল প্রমাণ করে। কারণ এগুলি প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সদা-সর্বদা সবত্র হাযির (উপস্থিত) বা সবকিছুর নাযির (দর্শক) নন; বরং বরং উম্মাতের আমল তাঁর কাছে ‘হাযির’ করা হলে তিনি শুধু ‘আমলের’ নাযির বা দর্শক হন। তিনি উম্মাতের নিকট হাযির হন না; বরং উম্মাতের আমল তাঁর নিকট হাযির করা হয়।

(২) আমরা দেখেছি যে, দশজনেরও অধিক সাহাবী থেকে অনেক সহীহ সনদে বর্ণিত, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে সংকলিত ‘মুতাওয়াতির’ পর্যায়ের হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, তাঁর ওফাতের পরে সাক্ষী বা হাযির-নাযির হয়ে উম্মাতের সকল কর্ম দেখাশুনা করার বামেলা মহান আল্লাহ তাঁকে দেন নি। বরং তাদের অনেকের পরিবর্তন-উদ্ভাবন তিনি জানবেন না। দু-একটি দুর্বল বা একক হাদীসের মর্ষিমাফিক “ব্যাখ্যা”-কে আকীদার মূল বানিয়ে তার ভিত্তিতে কুরআন এবং মুতাওয়াতির হাদীসগুলির সুস্পষ্ট নির্দেশনা ব্যাখ্যার নামে বাতিল করার অর্থ ‘মিথ্যা’ ও ‘ব্যাখ্যা’ দ্বারা ধর্ম বিকৃত করা।

চতুর্থ দলীল: মহান আল্লাহ বলেন:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ

“তুমি কি দেখ নি কেমন করলেন তোমার রব হস্তীবাহিনীর সাথে।”[17]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর “হাযির নাযির” ও “ইলমুল গাইব” প্রমাণ করতে এ আয়াত উল্লেখ করা হয়। তাঁরা বলেন, এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর জন্মের পূর্বেও আবরার হস্তীবাহিনীর বিপর্যয় দেখেছিলেন। এথেকে বুঝা যায় যে, তিনি পূর্বের ও পরের সকল কিছু দেখেন, তিনি সর্বজ্ঞ এবং সদা-সর্বত্র হাযির বা বিরাজমান!!

এদের কেউ হয়ত সত্যিই অজ্ঞ এবং কেউ জ্ঞানপাপী। তা নাহলে আরবী ভাষা সম্পর্কে অভিজ্ঞ সকলেই জানেন যে, আরবীতে “দেখা” বলতে শুধু চক্ষুর দেখা বুঝানো হয় না, জানা বা জ্ঞানলাভও বুঝানো হয়। কুরআনে এরূপ ব্যবহার অগণিত। দুটি নমুনা দেখুন। কাফিরদের বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন:

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ

“তারা কি দেখে নি আমি ধ্বংস করলাম তাদের পূর্বে কত জাতি?”[18]

তাঁদের যুক্তির ধারায় এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আবু জাহল-সহ সকল কাফিরই “হাযির-নাযির” বা অতীত-বর্তমান সবকিছুর দর্শক। তারা নূহ (আঃ) এবং অন্যান্য নবীদের (আঃ) যুগের কাফিরগণের ধ্বংসলীলার সময় উপস্থিত ছিল ও তা অবলোকন করেছিল!! অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا

“তোমরা কি দেখ নি কিভাবে সৃষ্টি করলেন আল্লাহ সপ্ত আসমানকে স্তর-বিন্যস্তকরে?”[19]

আমরা কি বলব যে, কুরআন পাঠকারী ও শ্রোতা সকলেই সপ্ত আকাশ সৃষ্টির সময় “হাযির” বা উপস্থিত ছিলেন এবং তা অবলোকন করেছিলেন?!

“হাযির-নাযির”, “ইলমুল গাইব” ইত্যাদি বিষয়ের সকল “দলীল”-ই এরূপ। এভাবে আমরা দেখছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে এ সকল বানোয়াট ও মিথ্যা কথা যারা বলেন, তাঁরা তাঁদের কথাগুলোর পক্ষে একটিও দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট আয়াত বা হাদীস পেশ করছেন না। তাঁরা অপ্রাসঙ্গিক বা দ্ব্যর্থবোধক কিছু আয়াত বা হাদীসকে মনগড়াভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং এরপর এরূপ ব্যাখ্যার উপরে নির্ভর করে তাঁরা অগণিত আয়াত ও সহীহ হাদীস বাতিল করে দেন। যারা এরূপ ব্যাখ্যার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চান তাঁদের অনেকের নেক নিয়্যাত ও ভক্তি-ভালবাসা হয়ত নির্ভেজাল। তবে তাঁরা ভাল উদ্দেশ্যে ওহীর নামে মিথ্যা বলেছেন এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-

এর নামে এমন কথা বলেছেন যা তিনি কখনোই নিজের বিষয়ে বলেন নি।

দ্বিতীয় কারণ: এ সকল কথাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর মর্যাদা-বৃদ্ধিকর বলে মনে করা এবং এ সকল কথা বললে তাঁর প্রতি ভক্তি, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধি বা পূর্ণতা পাবে বলে মনে করা।

নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর ভক্তি ও ভালবাসা এবং তাঁর প্রশংসা করা ঈমানের মূল ও মুমিনের অন্যতম সম্বল। তবে এ জন্য কুরআনের অগণিত আয়াত ও অগণিত সহীহ হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশের বাইরে আমাদের যয়ীফ, মিথ্যা, বানোয়াট কথা বলতে হবে, বা যুক্তি, তর্ক, ব্যাখ্যা, সম্ভাবনা ইত্যাদি দিয়ে কিছু কথা বানাতে হবে এ ধারণাটিই ইসলাম বিরোধী।

সর্বোপরি, আমরা যে বিষয়টিকে তাঁর জন্য মর্যাদাকর বলে মনে করছি সেটা প্রকৃতপক্ষে অমর্যাদাকর হতে পারে। হাযির-নাযির বিষয়টিই দেখুন। আমরা জানি, মর্যাদাহীন ব্যক্তির মর্যাদাশীল ব্যক্তির নিকট ‘হাযির’ হন। রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, প্রশাসক, বিচারক এবং সকল পর্যায়ের মর্যাদাময় মানুষদের কাছে সাধারণ মানুষেরা ‘হাযির’ হন। এ সকল মর্যাদাময় মানুষেরা কখনোই সাধারণ মানুষদের কাছে ‘হাযির’ দিয়ে বেড়ান না। প্রয়োজনে কর্মচারী-কর্মকর্তাগণ মানুষদের তথ্যাদি নিয়ে তাদের কাছে হাযির হন।

সহীহ হাদীসগুলো রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর এ মর্যাদাই প্রমাণ করেছে। তিনি তাঁর পবিত্র কবরে অবস্থান করছেন। মহান আল্লাহ অগণিত ফিরিশতা নিয়োগ করেছেন যারা পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে উম্মাতের দরুদ-সালাম তাঁর নিকট পেশ করেন। এটিই তো মর্যাদার পূর্ণতা। কিন্তু অতিভক্তির নামে যদি কেউ দাবি করেন যে, তিনি নিজেই উম্মাতের দ্বারে দ্বারে হাযির দিয়ে বেড়ান তবে তা তাঁর মর্যাদা বাড়াবে না কমাতে পাঠক একটু চিন্তা করুন।

এজন্য মুমিনের নাজাতের একমাত্র উপায় সকল ক্ষেত্রে বিশেষত, আকীদা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আক্ষরিকভাবে কুরআন ও সুন্নাহর উপর নির্ভর করা। আমলের ক্ষেত্রে কোনো আমল কারো জন্য জরুরী আর কারো জন্য কম জরুরী বা অপ্রয়োজনীয় হতে পারে। কিন্তু বিশ্বাসের বিষয় তা নয়। তা সকলের জন্য সমান। এজন্য আলিমগণ বলেছেন যে, বিশ্বাসের ভিত্তি হবে কুরআন কারীম বা মুতাওয়াতিহ হাদীসের উপর। অর্থাৎ যে বিষয়টি বিশ্বাস করা মুমিনের জন্য প্রয়োজন সে বিষয়টি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সকল সাহাবীকে জানিয়েছেন এবং সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষাতেই জানিয়েছেন। আর এরূপ বিষয় অবশ্যই কুরআনে থাকবে বা ব্যাপক প্রচারিত ‘মুতাওয়াতিহ’ হাদীসে থাকবে।

বিশ্বাসের ভিত্তি ‘গাইবী’ বিষয়ের উপরে। এ সকল বিষয়ে ওহীর নির্দেশনা ছাড়া কোনো ফয়সালা দেয়া যায় না। কর্ম বিষয়ে কুরআন বা হাদীসে সুস্পষ্ট বিধান নেই এরূপ অনেক নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবিত হয়, এজন্য সেক্ষেত্রে কিয়াস ও ইজতিহাদের প্রয়োজন হয়। যেমন মাইক, ধূমপান ইত্যাদি বিষয়। কিন্তু বিশ্বাস বা আকীদার বিষয় সেরূপ নয়। এগুলোতে নতুন সংযোজন সম্ভব নয়। এজন্য আকীদা বিষয়ে কিয়াস বা ইজতিহাদ নিষিদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন ইমামগণ [20] আল্লাহর গুণাবলি, নবীগণের সংখ্যা, মর্যাদা, ফিরিশতাগণের সংখ্যা, সৃষ্টি, কর্ম, দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে ইজতিহাদের কোনো সুযোগ নেই। কুরআন ও হাদীসে যেভাবে যতটুকু বলা হয়েছে তাই বিশ্বাস করতে হবে। এ সকল ক্ষেত্রে আমরা ওহীর কথাকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন করতে পারি, কিন্তু যুক্তি দিয়ে কোনো কিছু সংযোজন বা বিয়োজন করতে পারি না।

এজন্য মুমিনের মুক্তির একমাত্র উপায় হলো, কুরআন কারীমের সকল কথাকে সমানভাবে গ্রহণ করা এবং কোনো কথাকে প্রতিষ্ঠার জন্য অন্য কথাকে বাতিল বা ব্যাখ্যা না করা। অনুরূপভাবে সকল সহীহ হাদীসকে সহজভাবে

মেনে নেয়া। ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে সাহাবীগণের অনুসরণ করা। যে বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্ট কিছু নেই এবং সাহাবীগণও কিছু বলেন নি, সে বিষয়ে চিন্তা না করা, কথা না বলা ও বিতর্কে না জড়ানো।

ফুটনোট

- [1] সূরা (৩৩) আহযাব: ৪৫; সূরা (৪৮) ফাৎহ: ৮; সূরা (৭৩) মুয্যাম্মিল: ১৫; সূরা (২) বাকারা: ১৪৩; সূরা (৪) নিসা: ৪১; সূরা (১৬) নাহু: ৮৯; সূরা (২২) হাজ্জ: ৭৮ আয়াত।
- [2] তাবারী, তাফসীর ২২/১৮, ২৬/৭৩; ইবন কাসীর, তাফসীর ৩/৪৯৮।
- [3] সূরা (২) বাকারা, ১৪৩; সূরা (২২) হাজ্জ, ৭৮ আয়াত।
- [4] সূরা (৪) নিসা: ৭৯, ১৬৬; সূরা (৫) মায়িদা: ১১৭; সূরা (১০) ইউনূস: ২৯; সূরা (১৩) রা'দ: ৪৩; সূরা (১৭) ইসরা (বানী ইসরাঈল): ৯৬; সূরা (২৯) আনকাবূত: ৫২; সূরা (৩৩) আহযাব: ৫৫; সূরা (৪৬) আহকাফ: ৮; সূরা (৪৮) ফাৎহ: ২৮ আয়াত।
- [5] সূরা (৩৩) আহযাব, ৬ আয়াত।
- [6] বুখারী, আস-সহীহ ২/৮০৫, ৮৪৫, ৪/১৭৯৫; ৫/২০৫৪; ৬/২৪৭৬, ২৪৮০; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৫৯২, ৩/১২৩৭, ১২৩৮।
- [7] সূরা (৮) আনফাল: ৭৫ আয়াত।
- [8] সূরা (৩) আল-ইমরান, ৬৮।
- [9] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১২৪৪, ১৪৩৪, ১৭৬৪; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৭৯৫।
- [10] বুখারী, আস-সহীহ ১/১৬২, ২৫৩; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩২০, ৩২৪।
- [11] বুখারী, আস-সহীহ ১/২৫৯।
- [12] আবু জাফর আহমাদ ইবনু সাঈদ দাউদী নামক একজন আলামিন সহীহ বুখারীর একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেন। তাঁর পরিচয় বা ব্যাখ্যাগ্রন্থটির নাম সম্পর্কে অন্য কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। ইবনু হাজার আসকালানী ফাতহুল বারী রচনায় এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি থেকে অনেক সময় উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন।

[13] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১/৫১৫, ২/২২৫।

[14] সূরা : ৭ আ'রাফ, ২৭ আয়াত।

[15] বায্যার, আল-মুসনাদ ১/৩০৭; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ৮/৫৯৪; বৃসীরী, ইতহাফুল খিয়ারাতিল মাহারাহ ৭/৭৪; আলবানী, যায়ীফাহ ২/৪০৪-৪০৬; হুওয়াইনি, আল-ফাতাওয়া আল-হাদীসিয়াহ (শামিলা) ২/১৪-১৫।

[16] কুরতুবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ, আত-তায়কিরাহ ফী আহওয়ালিল মাওতা ও উমূরিল আখিরাহ, পৃ. ২৪৯; আল-জামিয় লি আহকামিল কুরআন ৫/১৯৮; ইবনু কাসীর, তাফসীর ১/৫০০।

[17] সূরা (১০৫) ফীল: ১ আয়াত।

[18] সূরা (৬) আনআম: ৬ আয়াত।

[19] সূরা (৭১) নূহ: ১৫ আয়াত।

[20] বিস্তারিত দেখুন: গ্রন্থকার রচিত: কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা, পৃ. ৭০-৭৩।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=4836>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন